Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.74-82
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সুন্দরবনের জীবন-কাহিনি: 'সুন্দরবন' ও 'নোনাগাঙ'

সত্যা দেবনাথ
Ph.D গবেষক (NET JRF), আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract:

Sundarban is the world's largest solenary tree forest. It is located in two district of West Bengal and Bangladesh. There is not as much literature written about the Sundarban as there are materials for writing literature on the Sundarban . However, the number of literature written about the Sundarban is not insignificant. Since the second half of the 20th century many novels have been written about the Sundarban. The famous writer of Bengali fiction is Shivshankar Mitra and Shaktipada Rajguru. Shivshankar Mitra has written five novels and shaktipada Rajguru has written total of seven novels on Sundarban. They went to the Sundarbans, saw everything with their own eyes and presented it in the novels. An analytical discussion of these two novels centered on the Sundarban, 'Sundarban' by Shivshankar Mitra and 'Nonagang' by Shaktipada Rajguru is attempted in the article. The novels depict the natural beauty of the Sundarban alone with its fear and horror. In the pursuit of livelihood people suppress fear and live with tiger. Every day how many people is food for tiger. However, people of Sundarban still have a love and attraction to the beautiful forest.

Keywords: Sundarban, Nonagang, Shaktipada Rajguru, Shivsangkar Mitra, Mangrove.

সুন্দরবন পৃথিবীর সব থেকে বড়ো লবণাক্ত বনাঞ্চল। সুন্দরবনের ১৮৭৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদী-নালা ও বিল মিলিয়ে জলাকীর্ণ অঞ্চল। ১০২ টি বদ্বীপ নিয়ে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৯,৬৩০ বর্গ কিমি। সুন্দরবনের বন সম্পদ লবণাম্বু বৃক্ষের অরণ্যকে পৃথিবীর মানুষ ম্যানগ্রোভ বলে আর স্থানীয় নাম বাদাবন। সুন্দরবনের নাম কেন এরকম হয়েছে তা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। সমুদ্র উপকূলে সুন্দরী বৃক্ষের বন বলে এর নাম সুন্দরবন, নাকি সুন্দরবন দেখতে এত সুন্দর বলেই তার নাম এমন হয়েছে। আবার অনেকে বলেন সমুদ্র উপকূলের বন বলে এই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগনা এবং বাংলাদেশ এর অবস্থান। ১৫০ থেকে ২০০ বছর ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে জীবিকা নির্বাহ ও মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের প্রয়োজনে মানুষ সুন্দরবন তীরবর্তী জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি ঘরে তুলেছে।

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। কোনো কোনো রচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে একটু আধটু উঠে এসেছে সুন্দরবন আর কোনো কোনো সাহিত্যিক সুন্দরবনকে কেন্দ্র করেই অনেক সাহিত্য

রচনা করেছেন। সুন্দরবন সম্পর্কে একটি ভীতি কাজ করে বলে সাহিত্যিকরা সুন্দর বনে যেতে চাননা আর তাই সুন্দরবনকে নিয়ে লেখালেখির সংখ্যা এত কম। শেখ মইদুল ইসলামের কথায়-

> 'এখানকার নিম্নবর্গের মানুষের জীবন দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত। অথচ এই শ্বাপদ সঙ্কুল এলাকা থেকে কথাসাহিত্যিকরা অনায়াসে পেতে পারেন সাহিত্যের প্রচুর উপকরণ। তবে প্রত্যন্ত এলাকাকে নিয়ে লেখারও একটা বেশ ঝুঁকি আছে। কাছে গিয়ে সেখানকার জনজীবন নিরীক্ষণ না করলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।'[১]

এই ভয় জয় করে সুন্দরবনে প্রবেশ করে সুন্দরবন থেকে সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন যারা, তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। সুন্দরবনকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য ছড়া, কবিতা, নাটক, গান, প্রবন্ধ ও গল্প-উপন্যাস। সুন্দরবনে গিয়ে, সুন্দরবনে রাত কাটিয়ে, বনে প্রবেশ করে বনের সৌন্দর্য উপভোগ করে বাদাবনের মানুষদের সাথে কথা বলে তাদের সুখ-দুঃখ, জীবন সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করে এবং অনুভব করে তা গল্প উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন যারা, তাদের মধ্যে অন্যতম দুজন সাহিত্যিক হলেন শিবশঙ্কর মিত্র এবং শক্তিপদ রাজগুরু। তবে মনোজ বসুকে সুন্দরবনের প্রথম রূপকার বলা হয়ে থাকে এবং তার পরেই আমরা শিবশঙ্কর মিত্রের নাম পাই-

> 'সুন্দরবন ভিত্তিক যথার্থ কথাসাহিত্যে সূচনা ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর হাতে। বনাঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে তাঁর ভাবনা ধরা পড়েছে জলজঙ্গল বনকেটে বসত উপন্যাসদ্বয়ে। দক্ষিণের বাদাবন অঞ্চলের সংগ্রামী জীবনের দক্ষ রূপকার শিবশঙ্কর মিত্র।'[২]

অরণ্যনির্ভর বাংলা সাহিত্য জগতে এক অতি পরিচিতি নাম শিবশঙ্কর মিত্র (১৯০৯-১৯৯২)। লেখক ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার বেলফুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পূর্বে বিপ্লবী যুগান্তর দলের নেতা হিসেবে সাত বছর এবং স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের কারাগারে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসেবে চার বছর তিনি জেলে থাকেন। প্রতিকূল জীবনেও তিনি নিরলসভাবে তাঁর সাহিত্য সাধনা করে যান। প্রথমবার কারা মুক্তির পর তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন, তাঁর প্রথম রচনা 'লেনিনের সংক্ষিপ্ত জীবন' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদী ও বামপন্থী চিন্তাধারায় লালিত পত্রিকা 'যুগান্তর' ও 'অমৃত বাজার'-এ তিনি রেফারেন্স এডিটর রূপে কাজ করেন দীর্ঘদিন। দ্বিতীয় কারা মুক্তির পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাকারে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন এবং সাথে সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিভাগে তিনি অধ্যাপনাও করেন। তখন থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনা পুরোদমে চলে, বিশেষ করে সুন্দরবন নিয়ে তাঁর লেখালেখি তাকে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়। সুন্দরবনের সাথে তাঁর আত্মিক যোগ তাঁর পাঠকের চোখে পড়ে অনায়াসেই। তিনি ছোটবেলা থেকেই সুন্দরবনের গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। এই নদী বহুল অরণ্যজীবন নিয়ে তাঁর পাঁচটি উপন্যাস ও দশটি ছোট গল্প আছে। সুন্দরবনের বাসিন্দাদের প্রতি তিনি গভীর হৃদয়ের টান অনুভব করতেন। একটু সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি সুন্দরবনে চলে আসতেন, শুধু সুন্দরবনের অরণ্য ঘুরে বেড়াতেন না, সেখানকার মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে দিন কাটিয়েছেন। ঔপন্যাসিক নিজেই বলেছেন-

> 'আমার একাত্মবোধটা হঠাৎ একদিনে আসেনি। এসেছে সুন্দরবন ও ততোধিক সুন্দর উপকূলবাসী মানুষগুলোর সঙ্গে সুদীর্ঘকালের যোগাযোগের ফলে। সেই ১৯২৮ সাল থেকে...বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক। পিতৃদেবের

> 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও তাঁর মুখ থেকে শোনা সুন্দরবনের গল্পগুলি এই ব্যাপারে আমাকে কম প্রেরণা দেয়নি। তখন থেকেই সুন্দরবনের নদী-নালার রেখাচিত্র ও মানুষের ইতিবৃত্ত নিয়ে যেমন মেতে উঠি, তেমনি বনে ও এই অঞ্চলে আসা যাওয়া শুরু করি।"[৩]

সুন্দরবন নিয়ে শিবশঙ্কর মিত্রের লেখা উপন্যাসগুলো হলো- 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার'(১৯৫৫), 'সুন্দরবন'(১৯৬৫), 'বনবিবি'(১৯৬৬), 'রয়্যাল বেঙ্গলের আত্মকথা'(১৯৮৩), 'বেদে বাউলে(১৯৮৫)। এগুলোর মধ্যে তিনি 'সুন্দরবন' উপন্যাসের জন্য ভারত সরকারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পুরস্কার পান ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। সবগুলি উপন্যাসের পটভূমি সুন্দরবন এবং কাহিনি সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে রচিত।

আমাদের আলোচ্য 'সুন্দরবন' উপন্যাসের মোট নয়টি পরিচ্ছেদ। পুরো উপন্যাসের পটভূমি সুন্দরবনের বিপদসঙ্কুল বাদাবন। উপন্যাসে নির্দিষ্ট একটি কাহিনি নেই। নয়টি পরিচ্ছদের কাহিনি, চরিত্র, স্থান আলাদা, তবে এরা মূলত একই সূত্রে গাথা, তাই এটিকে অনায়াসে উপন্যাস বলা যায়। প্রতিটি কাহিনিতে লেখকের সুন্দরবনের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা স্পষ্ট হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের নায়ক সুন্দরবন তেমনি প্রতিটি পরিচ্ছেদের নায়িকাও যেন সুন্দরবন।

রহিম বাওয়ালির জীবনকথা আছে প্রথম পরিচ্ছেদে। খুলনা জেলার নোয়াখালিতে তার বাড়ি। সে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে যায় মধু, কাঠ বা গোলপাতা সংগ্রহ করার জন্য। তারা মাঝে মাঝে বনে ঢুকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে বেরিয়ে যায়। এ কাজে তারা অভ্যস্ত। সুন্দরবনের বিপদকে অগ্রাহ্য করে তাদের বাঁচতে হয়। জঙ্গলে যাওয়ার সময় রহিমের মাতৃহারা শিশুকন্যা মমতাজ বায়না করেছিল তার জন্য একটি পাখি নিয়ে আসতে, সেই পাখি ধরতে গিয়ে রহিম বাঘের মুখে পড়ে। যদিও রহিম কুড়ুলের ঘায়ে বাঘকে আহত করে নিজে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে সক্ষম হয়। কিন্তু বৃদ্ধ বাওয়ালি আয়না জানে রহিম হয়তো আর বাঁচবে না-

> 'সুন্দরবনের বাঘে কাউকে ছুলে সে আর বাঁচতে দেখেনি।'[৪]

এক পিতৃহৃদয়ের স্নেহের কথা বলাই গল্পের মূল উদ্দেশ্য। রহিম তার প্রয়োজনীয় কাঠ, মধু সংগ্রহ না করে আগে মেয়ের জন্য পাখি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়েছিল। আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরলে তার ছোট মেয়েটা তাকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে তখন পাঠকের চোখও সজল হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখি আছের কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে। কিন্তু আছের নিজে আহত হয়েও বাঘকে মেরে নৌকায় তুলে। আছের সুন্দরবনকে ভালোবাসে, সুন্দরবনের বাঘকে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই। গর্ব করে সোনাকে সে বলেছিল-

> 'কেন বলতে পারলিনা আমাদের দেশে সুন্দরবন আছে। তুই বুঝি বলতে পারলি না বাঘের কথা? আমার দেশে কত বাঘ আছে।'[৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদেও আমরা দেখি ইসমাইলের চোখের সামনে মোড়লকে বাঘে নিয়ে যায়। তারা সুন্দরী গাছ কাটতে জঙ্গলে গিয়েছিল। খুলনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চল হলো গল্পের পটভূমি। ইসমাইলরা যদিও মূলত ভাগচাষী, তবু তারা টাকা রোজগারের আশায় অরণ্য গিয়ে মাঝে মাঝে সুন্দরী গাছ কাটে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ফজলকে বাঘে নিয়ে যায়। সুন্দরবনের উপকূলের একটি হতদরিদ্র পরিবারে ফজল ও তার স্ত্রী ফরিদা এবং ভাই রসুল বাস করে। এদের সংসারে চরম অভাব, ফরিদা জোর করে ফজরকে

জঙ্গলে পাঠায় গুইসাপের চামড়া সংগ্রহ করার জন্য। ফজলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে জঙ্গলে যায় এবং বাঘের মুখে প্রাণ দেয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদের নায়ক ফটিক সুন্দরবনের রায়মঙ্গলের অধিবাসী বকস্ গাজীর ভবঘুরে জামাই। সে বাদাবনে ঘরজামাই হয়ে থাকলেও তার মন এখানে বসলো না, তবু বাদাবনে রয়ে যায় সে। মাঝে মাঝেই শ্বশুরের বন্দুক নিয়ে বনে শিকারে যায় ফটিক। ফটিকের স্ত্রী তার জন্য চিন্তা করলে সে বলতো-

> 'সাহস আছে বলেই তো বড়াই করি। বড়াই করতে গিয়ে বনে মরলে তো কবর দিতে তোমায় ডাকবো না।'[৬]

অতিরিক্ত সাহসই কাল হলো, একদিন ফটিক বাঘের মুখে প্রাণ হারালো। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পটভূমি যশোর-খুলনার অঞ্চল। এই গল্পের প্রধান চরিত্র মহেন্দ্র, তার শখ বাঘ শিকার করা। তার মা তাকে বলতো-

'এত বাঘ মারার শখ যখন তখন তোর বাঘের পেটেই যেতে হবে একদিন।'[৭]

একদিন সত্যি সত্যি বাঘের মুখে পড়েও মহেন্দ্র বাঘকে মেরে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার বারবার মনে হচ্ছিল সত্যিই মায়ের অভিশাপ কখনো সত্যি হয়না। সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা অভিরামের কথা পাই। সে চাষাবাদ করত কিন্তু একদিন লোভে পড়ে গুপ্তধনের সন্ধানে সে গভীর বনে ঢুকে পড়ে। অনেকদিন পর অভিরামের বন্ধু বাঘে খাওয়া তার পচা গলা দেহ উদ্ধার করে। অষ্টম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি মোকাশকে, সে মালঞ্চ নামে প্রকার চঞ্চল হরিণকে মারবার সংকল্প করে বনে ঢোকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে মালঞ্চকে মারতে পারেনা। একদিন সে মালঞ্চকে মারতে যায় সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জন শুনতে পেরে সে বুঝতে পারে শিকার একটি কিন্তু শিকারি দুজন। সঙ্গে সঙ্গে মোকাশের মনে মালঞ্চ জন্য দয়া হয়, সে জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে। সে প্রার্থনা করে বাঘও যেন মালঞ্চকে ধরতে না পারে।

শেষ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি জলে বাঘের আক্রমণ। কলিম আর এফাজ সুন্দরবনের মৈশেলী নদীতে বাঘের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। এফাজ বাঘের উপর তার বৈঠা উদ্যত করে। ঔপন্যাসিক এখানে বলেছেন-

'সুন্দরবনের এই জীবকে অস্ত্র উদ্যত করে ভয় দেখানো যায় না।...সে বন্দুক হলেও না।'[৮]

কলিমের হাতে বাঘ থাবা বসায়, বাঘ নৌকাতে উঠলে তারা জলে ঝাঁপিয়ে ডুবে থেকে কোনোমতে প্রাণ বাঁচায়।

সবগুলো কাহিনিতেই সুন্দরবনের বাঘের কথা আছে। বেশিরভাগ কাহিনিগুলোতে আমরা দেখি বাঘের মুখে মানুষের প্রাণ যাবার কথা। শুধু অভিরাম এখানে লোভের বশবর্তী হয়ে বনে গিয়েছিল এবং তার বাঘের মুখে প্রাণ গিয়েছিল। তাছাড়া প্রায় সবাই বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে বনে গিয়ে বাঘের মুখে প্রাণ দিয়েছিল। আর কিছু জনকে দেখি বাঘের থাবা সামলে কোনোরকম প্রাণহাতে করে ঘরে ফিরতে পেরেছিল। সুন্দরবনের ভয়ের কথা, সুন্দরবনের আতঙ্কের কথা ছাড়াও কাহিনিতে আছে সুন্দরবনের সৌন্দর্যের কথা। আর আছে সুন্দরবনের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা। সেই পরিবেশ মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে পারে, ঠিক তেমনি সুন্দরবনের তীরবর্তী মানুষগুলোরও বাইরের মানুষকে মোহগ্রস্ত করার, আপন করে নেবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে। এ প্রসঙ্গে শিবশঙ্করর মিত্র একবার বলেছিলেন-

> 'অপূর্ব সুন্দরবনের যেমন যেকোন মানুষকে মোহগ্রস্থ করার মোহিনী শক্তি আছে, তেমনি ততোধিক অপূর্ব এই মানুষদের যেকোন ব্যক্তিকে কাছে টেনে একান্ত আপন করে নেবার, একাত্ম করে নেবার এক অসাধারণ চুম্বক-সম আকর্ষণ আছে। কেননা এমন সরল, এমন দুর্ধর্ষ, এমন সবল ও তেজোময় মানুষ গোষ্ঠী মেলা দায়।'[৯]

সহজ সরল অথচ সাহসী মানুষগুলোর জীবনসংগ্রাম যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে সুন্দরবনের প্রতি মানুষগুলোর আকর্ষণ। সুন্দরবন নিয়ে মানুষগুলোর গর্বের অন্ত নেই। সুযোগ থাকলেও তারা সুন্দরবন ছেড়ে বাইরে কাজ করতে যায়না টাকার লোভে। আমরা এ কাহিনিগুলোতে অনেকজন বাওয়ালিকে পাই- আয়না মিস্ত্রী, রহিম, রঙিনা, মোকাম, কলিম, এফাজ এরা প্রতিদিনই প্রাণ হাতে করে জঙ্গলে যায়, জঙ্গলই তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র স্থান, তাই তাদের ভয় করলে চলে না।। কাহিনিগুলোতে কাঠুরিয়া আছে- ফজর, ইসমাইল এরাও তেমনি প্রাণ হাতে করে, সাহসে ভর করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়। প্রাণ বাঁচিয়ে সন্ধ্যেবেলা আপনজনের কাছে ঘরে ফিরতে পারলে তারা নিজেদের পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে ভাবে। এ চরিত্রগুলি উপন্যাসের আরণ্যক আবহে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রই সুন্দরবনের লাগুয়া গ্রামাঞ্চলের মুসলমান সমাজের বাসিন্দা, তবে কয়েকজন হিন্দু চরিত্রও আছে। প্রধানত যশোর-খুলনা জেলার মানুষদের সুন্দরবনের সাথে একাত্মতা ও প্রাণের আকুতি ধরা পড়েছে উপন্যাস। চরিত্রগুলোর কেউ কেউ কৃষক- এবাদুল, রসুল, অভিরাম, নিমাই, অধর- এদের জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলে যেতে হয়না তবু তারা কিসের যেন টান অনুভব করে জঙ্গলের প্রতি। তাই কোনো না কোনোদিন তারাও ঢুকে যায় গভীর জঙ্গলের ভিতরে। শক্তিপদ রাজগুরু সম্পর্কে নিতাই নাম বলেছিলেন-

> 'ঔপন্যাসিক শক্তিপদ রাজগুরু সুন্দরবনের গহন অরণ্যে অনেকবার গেছেন, এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, জেনেছেন তাদের সুখ-দুঃখ ও কান্না হাসির তরঙ্গে জীবনের চাকা কিভাবে ঘুরে চলে। লেখক বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তাঁর কৌতূহল প্রবৃত্তিও অসীম। তাই সুন্দরবনের অরণ্য এবং অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা জানতে ছুটে গেছেন নানা দ্বীপে। তারপর চোখে দেখা, কানে শোনা আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করার পর অভিজ্ঞতার জারক রসে রচনা করেছেন সুন্দরবনের পটভূমিতে গল্প ও উপন্যাস।'[১০]

বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর জন্ম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার গোপবান্দী গ্রামে। তাঁর দীর্ঘ ৭০ বছরের সাহিত্যজীবনে একশোর বেশি উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেছেন তিনি। তাঁর সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো হলো- 'কুমারীমন', নোনাগাঙ'(১৯৬৩), 'নয়াবসত'(১৩৭৮), 'অধিকার'(১৯৮৪), 'চরহাসিল'(২০০৯), 'রায়মঙ্গল'(২০১২), 'খলসে খালিরগঞ্জ' ইত্যাদি। লেখক শক্তিপদ রাজগুরুর প্রথম গল্প 'আবর্তন' প্রকাশিত হয় 'দেশ পত্রিকায়' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। আর প্রথম উপন্যাস 'দিনগুলি মোর' ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'উল্টো'রথ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর আমৃত্যু তিনি সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'নোনাগাঙ' নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস করছি।

উপন্যাসটির পরিসর খুব ছোট, পুরো উপন্যাস জুড়ে আছে সুন্দরবনের প্রকৃতির চিত্র আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্ণিত হয়েছে সুরমান ও মরিয়মের প্রেমের কাহিনি। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক সুন্দরবনের ভয়ংকর প্রাকৃতিক রূপের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন-

> 'এ রাজ্যে মানুষ আসে ভুল করে। মানুষের জগৎ নয়, কোথাও কোনোখানে মানুষের জন্য খাদ্যের কোনো সংস্থান নেই। গহন সীমাহীন বন, রাত্রির তমসা ভেদ করে কানে আসে হিংস্র শ্বাপদদের মত্ত গর্জনধ্বনি, চোখের তারায় তারায় প্রজ্বলিত দৃষ্টি নিয়ে ফেরে জীবন্ত মৃত্যুর দূত।'[১১]

সুন্দরবনের সুন্দর রূপটিকে একেবারে অস্বীকার করে লেখক এখানে শুধুমাত্র অসুন্দর রূপ, ভয়ঙ্কর রূপটিকেই তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সুরমান নিজের গ্রামে, নিরাপদ আশ্রয়ে মায়ের যত্নে ছিল। সেইসময় তখন প্রেম হয় মরিয়মের সাথে। তখন তার মনে হত জীবন কত সুন্দর, জীবনে এত সুখ, এত আনন্দ, জীবন কত সহজ-সরল। কিছুদিন পর তার জীবনে জটিলতা শুরু হয়, মরিয়মকে মরিয়মের বাবা সাত কুড়ি টাকার লোভে মজিদ আলির কাছে বিক্রি করে দেয়। সাতকুড়ি থেকে বেশি টাকা রোজগারের জন্য সুরমান সুন্দরবনে যায় মজিদ আলির সাথে বাওয়ালির কাজে। নিজের মনের ভয়, মায়ের ব্যাকুলতা, মরিয়মের চোখের জল সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে মাসিক ৩০ টাকা ও খোরাকের বিনিময়ে সুরমান বাদাবনে চলে আসে-

> 'পেছনে পড়ে রইল ছায়া ঢাকা নশীপুরের খাল ওদের স্মৃতি বুকে নিয়ে জোয়ান সুরমান বাওয়ালি এল এ রাজ্যে। মহাজনের নৌকাতেই থাকে খায়, বনে কাজ করতে শিখছে।'[১২]

আত্মীয়বিহীন, পরিবারবিহীন, প্রিয়জনবিহীন এত দূরে একা থাকতে কতটা কষ্ট তা অনুভব করতে পারে সুরমান। সে বুঝতে পারে গ্রামের জীবনের আর বাদবনের জীবনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। মাঝিদের মধ্যে হেড মাঝি হলো মজিদ মিঞা। তার নেতৃত্বে সবাই বনে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হয়, সবাইকে সাবধান করা হয়, এখানে কাজ করা যে কতটা ভয়ের তা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সুরমান শুধু টাকার কথা ভেবে, মনের ভয় চেপে সুন্দরবনে রয়ে যায়।

একদিন সুরমান বাঘের সামনে পড়ে, সামনে থেকে সে মৃত্যুকে দেখে। হঠাৎ করে তার সামনে মজিদ মিঞা চলে আসে সে সুরমানকে বাঁচিয়ে দেয় নিজের জীবন দিয়ে। সেইদিন বাঘের মুখে একজন না একজনকে প্রাণ দিতেই হত। মজিদ হয়তো মরিয়ম এবং সুরমানের ভালোবাসার কথা ভেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় সুন্দরবনে তারা কতটা ঝুঁকি নিয়ে প্রাণ হাতে করে কাজ করতো। তারপরে আর সুরমান ও মরিয়মের বিয়েতে কোনো বাধাই থাকলো না কিন্তু তবুও মরিয়মের বাবা আরো টাকার লোভে মরিয়মকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয়। সুরমানের স্বপ্ন সত্যি হয় না, সে একদিন শুনতে পারে জলে ডুবে মরিয়ম মারা গেছে।

চোখের সামনে নিজের মৃত্যুকে দেখে এবং মজিদের মৃত্যুর পর সুরমানের মনে পরিবর্তন আসা শুরু হয়, এবং মরিয়মের মৃত্যুর পর তার মন পুরোপুরি পাল্টে যায়। সে বাদাবনকে ভালোবেসে রয়ে যায়। যে বাদাবনকে সে ভয় পেত এবং ঘৃণা করতো, এবার সে এখানে মন থেকে ভালোবাসে মাঝি হয়ে রয়ে গেল-

> 'বনের আহ্বান সে শুনেছে, সে দেখেছে নিভৃত রাতে প্রকৃতির স্তব্ধ রূপের মহান সৌন্দর্য। ভালোবেসে ফেলেছে এই কালো নদী সবুজ বন। এই মোহ থেকে তার নিস্তার নেই। বলে উঠে নদীর বাঁকে বাঁকে এখানে কবর, বনে বনে ছড়ানো মরণ, আমার জন্যেও রয়েছে এমনি শেষ দিন তবুও সংসার ছেড়ে এর মহব্বতে আটকে রয়েছি বাবু, চোখের জলে গাঙের পানি লোনা হয়ে গেল তবু মায়া কাটল না।'[১৩]

উপন্যাসের পুরো কাহিনিটাই সুরমান নৌকায় বসে গল্পের কথককে বলেছিল। বৃদ্ধ বয়সে সুরমান তার নিজের জীবনের কাহিন বলে চলেছিল গল্পকথককে একটি রাত্রিবেলা নৌকো চালাতে চালাতে। গল্প শেষে গল্পকথকের চোখ ছল ছল করেছিল আর এত বছর পরে নিজের জীবনের কাহিনি বলে সুরমানের চোখও শুকনো ছিল না। সুরমান নৌকায় আরোহী নিয়ে তিনদিন তিনরাত্রি ধরে ভাটার টানে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে। নৌকায় আরো পাঁচজন মাঝি ছিল সুরমান ছাড়া সবাই প্রাণের দায়ে জীবিকার তাগিদে সুন্দরবনে এসেছে। সবার মনে ভয়, সবাই প্রাণ হাতে করে কাজ করে। এ গল্প সুরমানের সুন্দরবনের প্রতি ভয় থেকে ভালোবাসা তৈরি হওয়ার গল্প, এ গল্প তার নিজের জীবন পরিবর্তনের গল্প, আর এ গল্প তার জীবন উপলব্ধির গল্পও বটে। অবশ্য যে মজিদ সুরমানকে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছিল, সেই মজিদকে সে ভুলেনি। সুন্দরবনের মাঝি হয়ে নদীতে নৌকো নিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবার সে মজিদের কবরে নামাজ পড়ে-

> 'আজও যাবার পথে তারা এইখানে নামাজ পড়ে যায়- তার আত্মার শান্তি কামনায়। 'চেরাগ' এ বনে জ্বলে না, রেখে যায় ওই আহার্য আর পরিধেয়।'[১৪]

আলোচ্য উপন্যাসেও আমরা দেখি মজিদকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হয়েছে। সুন্দরবনের ভয়ানক রূপের পাশাপাশি সুন্দরবনের সুন্দর রূপেরও পরিচয় আছে উপন্যাসে। একদম কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখে জীবনের মানে বুঝতে শিখেছিল রহিম বাওয়ালি, আছের, ইসমাইলরা। আর মালঞ্চকে নিজে না মারতে পেরে মোকাম যখন দেখল বাঘের ভয়ও মালঞ্চ জীবন নিয়ে ছুটছে তখন সে জীবনের মানে বুঝতে পারল। সে আর মালঞ্চকে মারার চেষ্টা করল না। বরং সে মনে মনে প্রার্থনা করল মালঞ্চ যেন বাঘের মুখ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। সুরমানের প্রথমে সুন্দরবনে এসে মনে হয়েছিল- এটা মৃত্যুপুরী, সেই সুন্দরবনকেই একসময় তার মনে হয়েছে প্রাণ জুড়ানোর জায়গা। চোখের সামনে মজিদের মৃত্যু ও মরিয়মের মৃত্যু সংবাদ তার এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

বাদাবনের মানুষদের জীবন বাঘ, কামোটের ভয়ে অস্থির আর সে সঙ্গে আছে বাইরের অনুপ্রবেশ ও শোষণ। প্রাণ হাতে করে কাঠ, মধু, গোলপাতা সংগ্রহ করেও মানুষগুলো কিন্তু সঠিক দাম পায়না। বাইরের মহাজন প্রতিনিয়ত তাদের শোষণ করে চলে। বাইরের মানুষের শোষণের জন্যই সুন্দরবনের মানুষগুলোর জীবন আরও বেশি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ।'সুন্দরবন' ও 'নোনাগাঙ' এ দুটি উপন্যাসই পুরোপুরি সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখা। সুন্দরবনের মানুষদের নিয়ে লেখা দুটো উপন্যাসেই সুন্দরবনের ভয় ও ভয়ঙ্কর রূপের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা যেমন আছে তেমনই প্রধান হয়ে উঠেছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কথা। দুটি উপন্যাস মিলে মোট পাঁচজনকে আমরা বাঘের মুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখা যায়। আহত হয়েছে আরও অনেক জন। তবু মানুষগুলোর সাথে বাঘের কেমন যেন একটা গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বাদাবনবাসী মানুষগুলো একটা প্রাণের টান অনুভব করে বাঘের সঙ্গে। বাঘকে দেখার আকাঙ্ক্ষা সবসময়

তাদের মনে থেকে যায়। বাঘ সম্পর্কে ভয় এবং মোহ দুটোই একসঙ্গে জেগে উঠে। বাদাবনের মানুষগুলোর জীবন সংগ্রামকে খুব সুন্দরভাবে উপন্যাসগুলিতে দেখানো হয়েছে। কত সহজ, সরল এদের জীবনযাপন- বাওয়ালি, কাঠুরে, শিকারি, মাঝি এরা সবাই সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জীবনকে আবর্তিত করেছে খুশি মনে, নিজস্ব ছন্দে।

সুন্দরবনকে নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু তবুও সুন্দরবনবাসী আজও উপেক্ষিত বাংলা সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকে বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে-

> 'বাংলা কথ সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তবাসি মানুষেরা উপেক্ষিত অবহেলিত হয়েছে, বাংলা কথাকাররা প্রান্তজনের কথা বলতে গিয়ে যতখানি অন্য ভূগোলে মন দিয়েছেন ততখানি গুরুত্ব ও গ্রাম্য সম্মান সুন্দরবন অঞ্চল ও তার প্রান্ত মানুষেরা পায়নি।'[১৫]

আগামীতে নিশ্চই সুন্দরবন নিয়ে, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে এবং সুন্দরবনের মানুষদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হবে। সুন্দরবনের মানুষের জীবনযাত্রা সাহিত্যে আর উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হবে- এই প্রত্যাশা সাহিত্যের পাঠক হিসেবে সবার থেকে যায়।

তথ্যসূত্র:

১. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম(সম্পাদিত), 'সুন্দরবন কথাসাহিত্যে বিশেষ সংখ্যা'(প্রথম খন্ড), সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০১৪, পৃষ্ঠা-৫৫।
২. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম(সম্পাদিত), 'সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা'(দ্বিতীয় খন্ড), সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১৪, পৃষ্ঠা-৩৮।
৩. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, সপ্তম মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪।
৪. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', তদেব, পৃষ্ঠা-৩২৮।
৫. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩০।
৬. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪৪।
৭. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪৮।
৮. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৯।
৯. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।
১০. নাগ নিতাই, 'কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ রাজগুরু: স্রষ্টা ও সৃষ্টি', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৩২।
১১. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'(নোনাগাঙ), সত্যনারায়ণ প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৭১।
১২. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'(নোনাগাঙ), তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭৭।
১৩. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'(নোনাগাঙ), তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮১।
১৪. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'(নোনাগাঙ), তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮০।
১৫. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম(সম্পাদিত), 'সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা'(দ্বিতীয় খন্ড), তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মিত্র শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, সপ্তম মুদ্রণ-২০১৩।
২. রাজগুরু শক্তিপদ, সেরা দশটি উপন্যাস, সত্যনারায়ণ প্রকাশন, কলকাতা-৭৩ প্রথম প্রকাশ-২০০৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম, 'সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা'(প্রথম খন্ড), সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।
২. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম, 'সুন্দরবন কথাসাহিত্যের বিশেষ সংখ্যা'(দ্বিতীয় খন্ড), সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১৪।
৩. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম, 'সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা'(প্রথম খন্ড), সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১০।
৪. মন্ডল নাজিবুল ইসলাম, 'সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা' (দ্বিতীয় খন্ড), সমকালের জিয়ন কাঠি প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১০।
৫. বিশ্বাস মন্টু, 'সুন্দরবনের লোককথা', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ-২০১২।
৬. সরকার কানাইলাল, 'সুন্দরবনের ইতিহাস', রূপকথা প্রকাশন, কলকাতা-৬৫, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১২।
৭. জানা দেবপ্রসাদ(সম্পাদনা), 'শ্রীখন্ড সুন্দরবন', দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬, পুনর্ম মুদ্রণ-২০০৮।
৮. ভট্টাচার্য দেবীপ্রসাদ, 'উপন্যাসের কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ-২০০৩।
৯. মুখোপাধ্যায় অরুনকুমার, 'কালের পুত্তলিকা'(তৃতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ-২০১৬।
১০. রায় দেবেশ, 'উপন্যাসে নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ-২০০৬।